ISSN: 2958-2776
Vol.: 2 Issue: 1 & 2 January-June & July-December 2023
Journal of One Initiative Research and Development
an international multidisciplinary journal

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Haji Shariatullah and the Faraji Movement: A Theoretical Analysis

Rafia Sultana*

**Rafia Sultana*, *PhD, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Bangladesh Islami University, Dhaka. Email: dr.rafiasultanadu314@gmail.com*

Abstract

In the 19th century, the Muslim society of Bengal was confined to the net of subjugation and superstition. During this crucial period, Haji Shariatullah came forward to East Bengal to guide the unruly people on the right track. He was highly educated, strong in the power of faith, and he was also considered as the great hero of the country's independence. He chose the struggle of ideals and rights against unequal forces. It showed the accurate way to the oppressed nations and the path of light to the wayward Muslims. His lifelong struggle was able to make them conscious Muslims. It gave them strength in religious, socio-economic and political spheres through the Islamic revival movement; which later came to be known as the Faraji movement. This way of obtaining rights was very friendly. He had to face the opposition of Muslims of different sects of his own religion, the unwanted eye-rolling of Hindu landlords and British rulers. He and his companions were subjected to various tortures including imprisonment for propagating the true teachings of the Holy Quran and Hadith and organizing the vast masses of East Bengal as an independent nation. The seeds of freedom he sowed, with the evolution of time and the skillful role of his followers, transformed into the freedom of Bangladesh.

Keywords: Haji Shariatullah, Faraji Movement, Islamic Revival, Superstition and Muslim Society

JEL Classification: B15, P14, P26, P36, P48, Z13

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে পরাধীনতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল বাংলার মুসলিম সমাজ। তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে পূর্ব বাংলায় এগিয়ে এসেছিলেন তদানিন্তন সময়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান, দেশ স্বাধীকারের মহানায়ক, হাজী শরীয়তুল্লাহ। পরাধীন জাতির অধিকার ও পথহারা মুসলমানদের আলোর পথ দেখানোর জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন অসম শক্তির বিরুদ্ধে আদর্শিক ও অধিকারের সংগ্রাম। তাদেরকে ইসলামী পূনর্জাগরণ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী

করে সচেতন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই ছিল তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম; যা পরবর্তীতে ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। অধিকার আদায়ের এ পথ ছিল অত্যন্ত বন্ধুর। নিজ ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের বিরোধিতা, হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের অযাচিত চোখ রাঙ্গানি মোকাবিলা করেই তাঁকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার, প্রতিপালন ও স্বাধীন জাতি হিসাবে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারাণকে সুসংগঠিত করায় তিনি ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ কারাবরণসহ বিভিন্ন অত্যাচারের শিকার হন। স্বাধীনতার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, কালের বিবর্তনে ও তাঁর অনুজদের দক্ষ ভূমিকায় তা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হয়।

Article Info:

Received: 03 February 2023
Accepted: 12 June 2023
Research Area: Political Studies and Islamic History
Author's Country: Bangladesh

ভূমিকা

স্বাধীনতা যেমন মানুষের জন্মগত অধিকার, তেমনি স্বাধীন ভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারাও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকার। স্বাধীনতা হারা মানুষের স্বাধীনতা অর্জন ও তার প্রকৃত মর্যাদার স্বাদ এ অঞ্চলের মানুষের কাছে তুলে ধরতে অগ্রপথিকের ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি ইসলাম ধর্মের বিকৃত অনুশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন খড়গ হস্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাবলে তিনি পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ ইবাদাত ও দেশ স্বাধীকারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক জীবনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটান। যদিও দেশীয় কুসংস্কারের গভীর তমসায় নিমজ্জিত এক শ্রেণির মুসলমান তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। এছাড়া ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি ও হিন্দু জমিদারসহ তাদের দোসররা জমিদারী হারানোর ভয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচারের পথ বেছে নেয়। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইতিহাসের পাতায় হাজী শরীয়তুল্লাহ স্বনামে দেদীপ্যমান হয়ে আছেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলার মানুষের ভাগ্যাকাশে বেজে ওঠে দূর্যোগের ঘনঘটা। এসময় বাংলার মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, অর্থনেতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক শ্রেণী ও বিত্তশালী হিন্দু জমিদারদের রোষানলে পড়ে পিছিয়ে যায়। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের স্বকীয়তাকে বর্জন করে সীমাহীন দূর্ভোগের মুখোমুখি হয়। এছাড়া ইংরেজদের বিমাতাসূলভ আচরণে মুসলমানগণ চাকরি এবং ক্ষমতা হারিয়ে দারিদ্রতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যায়। এসময় ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের সর্বস্তরে

ক্ষমতা ও সম্পদ হিন্দুদের করতলগত হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রভাবে পুরোনো মুসলিম জমিদারগণ তাদের জমিদারী বিক্রি করতে বাধ্য হন। সেই জমিদারীগুলো কিনে নেন সম্পদশালী হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা, ব্যবসায়ীগণ। এ সমস্ত নব্য জমিদারদের শোষণ পীড়নে জাতির জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠে। অন্যদিকে মুসলিম জাতি হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতমূলক কাজে ছেয়ে যায় তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ। এ সময়ের মুসলিম সমাজের জনপ্রিয় আচার আচরণগুলো ইতিহাস গবেষক ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান পাঁচ ভাগে চিহ্নিত করেছেন। এক. পীরতন্ত্র, দুই. সুফিতন্ত্র, তিন. বহিরাগত মুসলিম দ্বারা বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক প্রথা, চার. বাংলার সুফি সমাজে শিয়াদের প্রভাব, এবং পাঁচ. স্থানীয় আচার আচরণ গ্রহণ। (খান,২০০৭) এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণ করে। বহিরাগত মুসলমানরা নিজেদেরকে অভিজাত মনে করে ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে নীচু শ্রেণি হিসেবে গণ্য করতেন। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রেও তারা নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের এড়িয়ে হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিতেন। শিক্ষাদীক্ষার অভাব এবং ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে হিন্দুদের জাতিবর্ণশ্রেণি ব্যবস্থা মুসলিম সমাজেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। (মোহাম্মদ, ২০১৫) বাংলার মুসলিম জাতির এমনি এক ক্রান্তিকালে আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী

জন্ম

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। আট বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। শিশু শরীয়তুল্লাহর লালন-পালনের দায়িত্ব তুলে নেন তাঁর নিঃসন্তান চাচা, মোহাম্মদ আজীম। শামাইল গ্রামে আপন সন্তানের মতই চাচার স্নেহে বড় হতে থাকেন বালক শরীয়তুল্লাহ। (Faisal,2010)

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বারো বছর বয়সে তিনি জ্ঞান অন্বেষণে কলকাতায় মাওলানা বাশারত আলীর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কাছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শেষ করে তিনি হুগলী জেলার ফুরফুরাতে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদ কোর্টের কর্মকর্তা তাঁর চাচা মুহাম্মদ আশিক মিয়ার কাছে আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। মুর্শিদাবাদে এক বছর থাকার পর তিনি তাঁর চাচা-চাচীর সঙ্গে নিজ মাতৃভূমি শামাইল গ্রামের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বহনকারী পালতোলা ছোট নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে যান। কিন্তু চাচা-চাচীর কোন হদিস না পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি কলকাতায় তাঁর শিক্ষক মাওলানা বাশারত আলীর কাছে ফিরে আসেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে

শরীয়তুল্লাহ তাঁর এই মহান শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। (খান, ২০১০) যা তখন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত।

উচ্চ শিক্ষা

হাজী শরীয়তুল্লাহর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান এর গবেষণা থেকে। এক্ষেত্রে তিনি তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করেছেন তাঁর সমাধিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি, তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দুরর-ই- মুহাম্মদ পুঁথি, আবদুল হালীম রচিত হাজী শরীয়তুল্লাহ (পাণ্ডুলিপি) এবং ওয়াজির আলীর মুসলিম রত্নহার ইত্যাদি থেকে। তিনি আরব দেশে হাজী শরীয়তুল্লাহর শিক্ষা জীবনকে ৩টি ধাপে বিভক্ত করেন। যথা:

১. প্রথম পর্যায়ে তিনি মক্কায় বসবাসকারী মাওলানা মুরাদের কাছে আরবী সাহিত্য ও ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।
২. দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি হানাফী আইনজ্ঞ তাহির সোম্বলের নিকট ধর্মীয় বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ করার সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া সুফিবাদের রহস্য সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করেন। তাহির সোম্বলের নিকট তিনি ১৪ বছর অধ্যয়ন করেন।
৩. তৃতীয় পর্যায়ে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করার জন্য তাঁর শিক্ষক তাহির সোম্বলের অনুমতি নিয়ে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি দুই বছর অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানের বহরকে সমৃদ্ধ করে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কা থেকে ১৮১৮ সালে তিনি তার শিক্ষাগুরু তাহির সোম্বলের আপত্তি সত্ত্বেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। (খান, ২০০৭)

দেশে প্রত্যাবর্তন ও আদর্শিক দ্বন্দের সূচনা

দেশে প্রত্যাবর্তন করেই হাজী শরীয়তুল্লাহ কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তাঁর দেশে ফেরার পথে সংঘঠিত একটি গল্প ঐতিহাসিক জেমস্ ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনকালে একদল ডাকাত তাঁর আরব দেশের স্মৃতিবিজড়িত অনেক জিনিস পত্র, বইপুস্তকসহ সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। বই-পুস্তক ছাড়া জীবন অসহনীয় হবে মনে করে তিনি নিজেই ডাকাত দলের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাদের সাথে অনেক স্থানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মীয় সচেতনতা দেখে এই দুষ্টু লোকদের চেতনা জাগ্রত হয় এবং তারা তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যায় । এই গল্প উল্লেখ করে জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন যে, 'এইভাবেই এই বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।'(Wise,1883, p. 22) এছাড়া আবদুল হালিম তাঁর রচিত হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনা করেছেন যে, হাজী যখন বাড়ীতে আসেন তখন তাঁর লম্বা দাঁড়ি ও পাগড়ির জন্য কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁকে দেখতে উৎসাহী অনেক লোক বাড়ীতে জড়ো হয়। তখন মাগরিবের নামাজের সময় হলে তিনি আযান দিয়ে তাদেরকে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য আহবান করেন। কিন্তু তারা সবাই নামাজ আদায় না করেই চলে

যায়। তাদের ধর্মীয় উদাসীনতা তাঁকে কষ্ট দেয়। এরপর সেই রাতেই তাঁর অসুস্থ মুমূর্ষ চাচা মোহাম্মদ আজিম মারা গেলে তিনি আরেকটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে দুঃখ বোধ করেন। কারণ, মৃতব্যক্তির দাফনের সময় যেসব অনৈসলামিক আচার-ব্যবহার সমাজে প্রচলিত ছিল হাজী শরীয়তুল্লাহ তাতে আপত্তি জানালে গ্রামবাসীরা দাফন কাজে অসহযোগিতা করে। এই ঘটনায় তিনি পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেন। ঐ দিন থেকেই তিনি তার সংস্কার আন্দোলন নিজ গ্রাম থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহেও প্রচার করতে থাকেন। এ কার্যক্রমে তিনি ইসলামে নির্দেশিত ফরজ নীতিসমূহ পালনের উপর জোর দেয়ায় তাঁর উদ্যোগ 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিতি পায়। (খান, ২০০৭) তাঁর এই আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন,

"For several years Sharia'tullah quietly disseminated his new doctrines in the villages of his native district, encountering much opposition and abuse, but, attracting a band of devoted adherents, he by degrees acquired the reputation of a holy man." (Wise, 1883, p. 22) তবে এই আন্দোলনের সূচনা পথটি ছিল কন্টকাকীর্ণ। তাই তিনি নতুনভাবে ভাবতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বার মক্কা সফর

হাজী শরীয়তুল্লাহ ভেবে দেখলেন যে তিনি তাঁর মহান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছেন। এ বিষয়টি তাঁকে আত্মদহনে পোড়াতে লাগল। তাই তিনি আবার মক্কায় ছুটে গেলেন। আরো দুই বৎসর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবনী সংক্রান্ত উপাদানগুলোতে বর্ণিত আছে যে এ সময় তিনি একে একে তিনবার প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। প্রতিবারই তিনি তাঁকে দেশে ফিরে প্রকৃত ইসলাম প্রচার করার আদেশ করেন। এ আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর শিক্ষক তাহের সোম্বলকে জানালে তিনি তাঁকে স্বদেশে ফিরে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেন। (Faisal,2010)

হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন(১৮১৮-১৮৪০)

দ্বিতীয় বার হাজী শরীয়তুল্লাহ দেশে ফিরলেন আরো পরিণত এক কাণ্ডারী হয়ে। শুরুতেই যে গভীর তমসায় মুসলিম জাতি তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডুবে আছে তা থেকে তিনি তাদেরকে পরিত্রাণের নকশা তৈরি করলেন। পূর্ব বঙ্গের ঘুমন্ত মুসলমানদের বিভ্রান্তির ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে তিনি তাদেরকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় রত হলেন। গোলামীর জিঞ্জিরে শৃংখলিত আত্মভোলা মুসলমানদেরকে তিনি নিজেদের পরিচয় জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহবান করলেন। তিনি মনে করলেন মুসলমান যখন আত্মপরিচয় জানবে তখন তারা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ব্যতিত অন্য কারো অধীনতা মেনে নিবে না। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সংস্কার কার্যক্রম 'ফরায়েজী আন্দোলন' এর মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্নবীজ রোপন করেছিলেন। ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ পালনের

প্রতি গুরুত্বারোপ করে মুসলিম সমাজের কুসংস্কারসমূহ দূরীভূত করণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দেলনের সময়কাল ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত। তাঁর কর্মতৎপরতা পরিচালিত হত মাদারীপুরের শামাইল এবং ঢাকার নয়াবাড়ী; এ দুটি কেন্দ্র হতে। এই ফরায়েজী আন্দোলনকে নিম্নোক্ত ভাগে আলোচনা করা হলো।

ধর্মীয় মতাদর্শ

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে ইসলামের আদি শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটি কুসংস্কারমুক্ত ও বিশুদ্ধ সমাজ গড়ায় মনোনিবেশ করেন। হানাফী মতাবলম্বী হাজী শরীয়তুল্লাহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত শিক্ষাকে ভিত্তি করে তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের নীতিমালা নির্ধারণ করেন। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক জেমস টেইলর মন্তব্য করেন, "They profess to adhere to the strict letter of the Koran, and reject all ceremonies that are not sanctioned by it." (Taylor, 1840, p.248)

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান ফরায়েজী আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করে তাদের ধর্মীয় আদর্শের পাঁচটি নীতিমালা চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো:

১. মুসলমানদের তওবার প্রতি আহবান
২. ইসলামের ফরজ আহকাম পালনের উপর গুরুত্বারোপ
৩. তাওহীদের প্রতি আহবান এবং এর পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জনের নির্দেশ
৪. জুমা ও ঈদের নামাজের জন্য দারুল ইসলাম হওয়ার উপর শর্তারোপ
কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত প্রচলিত সামাজিক সমস্ত প্রথা ও উৎসবাদি পরিত্যাগের আহবান (খান, ২০০৭)

১. তওবার প্রতি আহবান

বিজাতীয় ধর্মীয় আচার আচরণে অভ্যস্ত পথ হারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববতী যাবতীয় পাপ কাজের জন্য তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার আহবানের মাধ্যমে তিনি তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেন। এ তওবার মাধ্যমে ব্যক্তি তার বিগত জীবনের পাপকাজগুলোর জন্য অনুশোচনাপূর্বক আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর বিধানানুযায়ী জীবন যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ফরায়েজীদের তওবার পদ্ধতি সম্পর্কে ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রপৌত্র বাদশাহ মিয়ার নিকট থেকে সরাসরি অবগত হন। তাদের তওবার বাক্য ছিল, "আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে সমস্ত শেরেক, বেদাত, নাফরমানি অন্যায়, অত্যাচার করিয়াছি সমস্ত হইতে তওবা করিলাম এবং ওয়াদা করিতেছি যে, আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করিব এবং হজরত রসুলুল্লাহ্ (দ:) সুন্নত, তরীকা মোতাবেক চলিব।" (খান,২০০৭, পৃ.১১৩)

প্রথানুযায়ী পীরগণ তাদের মুরীদদের হাতে হাত রেখে যে বাইয়াত পরিচালনা করে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ একে বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করে নিষেধ করেন। তাঁর অনুসারীরা উস্তাদকে স্পর্শ না করেই বাইয়াত গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে জেমস ওয়াইজ এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"He also prohibited the laying on of hands, which was customary at the initiation of a disciple, but required from, all "Tauba" or penitence, for past sins, and a resolution to lead a more righteous, and godly, life for the future." (Wise, 1883, p.22)

ফরায়েজীগণ তওবাকে সহজবোধ্য ও ফলপ্রসু করতে বাংলা ভাষায় শপথ পরিচালনা করতেন। কেননা, তখন মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করত। আরবী, ফার্সী বা উর্দু ভাষা তাদের জন্য দূরহ ছিল। এমনকি ইসলামের মূলবানী কালিমাও সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মত লোক খুব কম ছিল। তৎকালীন ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার বলেন,

A century ago, Muhammadanism seemed to be dying of inanition in Bengal. In the mosques, or amid the serene palace life of the Musalman nobility, a few *maulvis* of piety and learning calmly carried on the routine of their faith. But the Musalman peasantry of Bengal had relapsed into a mongrel breed of circumcised Hindus, not one in ten of whom could recite the *kalma*- a simple creed, whose constant repetition is a matter of unconscious habit with all good muhammadans. (Hunter, 1888, P 47)

এভাবে তওবার মাধ্যমে যারা দলে যোগ দিত তাদেরকে তওবার মুসলিম বা মুমিন বলা হত এবং তারা ফরায়েজীদের সমঅধিকার ভোগ করত।

২. ইসলামের ফরজ আহকাম পালনে গুরুত্বারোপ

হাজী শরীয়তুল্লাহ দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন মুসলমানগণ ঈমান আমল ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে বাংলার ইসলামকে মুমূর্ষ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। কেননা, পলাশী প্রান্তরে ক্ষমতা হারিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে । কুসংস্কার ও দুর্নীতির কালো ছোবল সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। বাংলার আকাশে দৃশ্যমান এই কালো মেঘ দূর করতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের মৌলিক বিধানকে বাস্তবায়ন করা যৌক্তিক মনে করলেন। এজন্য তিনি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কালিমা, নামাজ রোজা, জাকাত এবং হজ্জ্ব পালনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেন। দুররই- মোহাম্মদ এর পুঁথিতে এ কার্যক্রমের সফলতা সর্ম্পকে জানা যায়। যেমন,

সে পানি পাইল যাবে দরাক্ত ইমান তবে
তাজা হৈল হকুমে আল্লাহ।
তৈয়ব কলমা যেই ইমানের মূল সেই
দিনে দিনে হৈল ওস্তাত্তার +

রোযা যে বাগানের কলি নামাজ তাহাতে অলি
জাকাত বুলবুল খোশ লাহান।।
হজ্জ্ব সে গাছের ডাল শুন যত নেক হাল
মালদার যেই মোছলমান +
এই পাঁচ হৈতে যত দোশালা তেশালা কত
দীন এছলামির খুবি হৈল। (খান কর্তৃক উদ্ধৃত,২০০৭, পৃ. ১১৪)

৩. তাওহীদের প্রতি আহবান এর পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জন

মুসলমানদেরকে জাগ্রত করতে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের উপর জোর দিয়েছেন। তার এই পদক্ষেপ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে শুদ্ধকরণের দিক থেকে শুদ্ধীবাদী মতবাদ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি মনে করেন, তাওহীদ তথা ঈমান দুটি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত। ক. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং এর উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা ও খ. আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব হয় এমন সবকিছু পরিত্যাগ করা। তাঁর মতে, তাওহীদ শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের নাম নয়। এর সাথে আমলকে যুক্ত করতে হবে, এছাড়া মুসলমানগণের কোন কাজ বা বিশ্বাসের সঙ্গে যদি নাস্তিকতা, শিরক ও বিদ'আতের ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা থাকে তবে তা তাওহীদ বিরোধী বলে গণ্য হবে। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পুঁজার উৎসবে চাঁদা দেয়া, পীরদের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, ফাতিহা অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে তিনি তাওহীদের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে জনগণকে এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তাঁর তাওহীদ সম্পর্কিত মতবাদে আরবের ওয়াহাবী মতাদর্শের সাথে গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (Faisal,2010)

মূলত: তাওহীদের সঠিক ধারণা প্রচার করে তিনি মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে তাদের স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এটা মুসলমানদের স্বাধীনতার চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে।

৪. জুমা ও দু' ঈদের নামাজের জন্য দারুল ইসলাম হওয়ার উপর শর্তারোপ

ব্রিটিশরা যখন সমগ্র ভারতের শাসনভার নিয়ে নেয় তখন আলেমগণ তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দিল্লীর শাহ আবদুল আজীজের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি ভারতকে দারুল হরব বা শত্রুদেশ রূপে চিহ্নিত করেন। ফলে তৎকালে ভারতের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনসমূহের মুসলমানগণ জুমা এবং ঈদের নামাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। বৃটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের মতে, "ওয়াহাবীগণ ধর্মীয় আবেগে ভারতকে দারুল হারব আখ্যায়িত করে এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। এছাড়া তারা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে শুক্রবারের নামাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে।" **(হান্টার, ২০১৬, পৃ ১৪২-১৪৩)**

হাজী শরীয়তুল্লাহ এই ফতোয়াকে সমর্থন করে বৃটিশ আমলে এই দু'ধরণের নামাজ স্থগিত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারীগণ ও এব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান গঠন হলে তারা পুনরায় এ নামাজসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরায়েজীগণ হানাফী মাযহাব

অনুযায়ী ঈদ ও জুমার নামাজ বৈধ হওয়ার জন্য 'মিসর আল জামি' হওয়ার শতার্রোপ করেছেন। অর্থাৎ এমন স্থান যেখানে মুসলিম সুলতান দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক ও বিচারক উপস্থিত থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এমন স্থান ছিল বিরল। (খান,২০০৭) হাজী শরীয়তুল্লাহর ঈদ ও জুমার নামাজ স্থগিতের ঘোষণা মূলত অমুসলিম ভিনদেশী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করে তোলার ঘোষণা। কেননা জুমা বা ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মুসলিম প্রশাসকের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের চেতনাকে আঘাত করলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তাদেরকে বোঝালেন ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহ বাস্তবায়ন করতে হলে আগে হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. নূহ-উল আলম লেনিন এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> উনিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীরের সশস্ত্র উত্থানের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল পূর্ব বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তার ছেলে পির দুদু মিয়ার নেতৃত্বে শোষিত-বঞ্চিত কৃষক, তাঁতি ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের এক প্রবল ধর্মাশ্রয়ী ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্কার আন্দোলন সাম্রাজবাদ ও জমিদারি শোষনবিরোধী জাগরণে পরিণত হয়েছিল। শরীয়তুল্লাহ এই ফতোয়া দেন 'দার - উল-হরব' এ অর্থাৎ বিধর্মী শাসিত এদেশে জুমার ও ঈদের নামাজ না-জায়েজ। (লেনিন, ২০১৫, পৃ ১৩৫)

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন তাইউনী আন্দোলনের নেতা মাওলানা কেরামত আলীর মত আলেমগণ যেখানে ইংরেজর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য দেশকে "দারুল আমান" (নিরাপত্তার দেশ) ঘোষণা করে ঈদ ও জুমার নামাজ পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, সেখানে হাজী শরীয়তুল্লাহ ইংরেজদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে অনুসারীদেরকে জুমার পরিবর্তে জোহর নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। এটি তাঁর নির্ভীক নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে। এর মাধ্যমে তিনি মূলত শাসক শ্রেনীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং ইংরেজদের বিতাড়িত করে বৈধভাবে জুমার নামাজ কায়েম করার জন্য মুসলিম সমাজকে তৎপর করেন।

৫. কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগের আহবান

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর শুদ্ধীবাদী আন্দোলনে কুফর বিদ'আত এবং সামাজিক কুসংস্কার থেকেও মুসলিম সমাজকে কলুষমুক্ত করেন। সমসাময়িক উৎসগুলো থেকে সেসব কুফর, বিদ'আত এবং কুসংস্কারসমূহ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, তৎকালে রচিত পুঁথিতে দুরর ই মোহাম্মদ লিখেছেন,

> মহরমে এমাম হাছেন হোছেনের
> হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের+
> পাঁচ পীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া।।
> উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া+
> প্রথম হায়েজ যদি হইত কাহার

কলাগাছ গাড়িত বাড়ির চারিধার।।
সে সব বেদাত এবে হইল মেছমার।।
উঠিল এসলামি সূর্য্য গগন মাঝার +
হাজী শরিতুল্লা হেথা তশরিফ আনিয়া
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া+ (খান কর্তৃক উদ্ধৃত,২০০৭, পৃ. ১২৫)

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের সাথে নিয়ে অধিকাংশ কুসংস্কার ও ইসলাম বিরুদ্ধ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদি বিনা বাঁধায় সমূলে উৎপাটিত করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল ও নিজেদের অভিজাত দাবি করা মুসলমানদের পক্ষ থেকে সমালোচনা ও প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয় । স্রোতের প্রতিকূলে গিয়েও তিনি তাঁর সংস্কার কার্যক্রমকে শক্ত হাতে হাল ধরে এগিয়ে নিয়ে যান। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

৫.১ পীরবাদ

হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন বাংলার মুসলমানগণ পীরবাদে নিমজ্জিত। তারা পীরগণকে অতিমানবীয় গুণাবলিতে গুণান্বিত মনে করে। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ তাদেরকে হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক জ্ঞানে ভক্তি করত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মুসলমানগণ বিভিন্ন বিপদ আপদ, রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন পীরের ধরণা দিত। বিপদে তাদের স্মরণ করে তাদের নাম জপত। তাদের নামের দোহাই দিত। তাদের উদ্দেশ্যে মানত করত। জীবিত পীরদের দরগা ও মৃত পীরদের মাজারে শিরনী হিসেবে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল উৎসর্গ করত। পূর্ব বাংলায় খোয়াজ খিজির, জিন্দা, গাযী, পীর বদর, পাঁচ পীর, সত্য পীর, গাজী-কালু ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। ড. আবদুল করিম এর গবেষণায় এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তার মতে, মুসলমানদের পীরের ধারণায় মুসলমান ও হিন্দু উভয় উপাদানই আছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী মুসলমান হলে তাদের পূর্বের দেব-দেবীর অতি প্রাকৃত শক্তির ধারণাকে পীরপ্রথার সাথে মিলিয়ে ফেলে। (করিম, ২০০৬)

সুফিবাদের কাদেরিয়া মতাদর্শে দীক্ষিত হাজী শরীয়তুল্লাহ সুফিবাদকে ধর্মীয় জ্ঞানের উচ্চতর অংশ মনে করতেন। এজন্য তিনি বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরপ্রথাকে সংস্কারের আওতায় নিয়ে আসেন। কেননা, মুসলমানগণ পীরদেরকে অতি ভক্তি করে দেবতা পর্যায়ে নিয়ে যেত। এছাড়া তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করত। অনেক মুরীদ পীরকে সিজদা পর্যন্ত করত। এমনকি তারা বিশ্বাস করত তাদের আমল-আখলাকে ঘাটতি থাকলেও পীরগণ তাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। পীরদের এই অতিমানবীয় রূপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি পীরদের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানান যে, তারা শিক্ষকের মত, এর চেয়ে বেশী কিছু নন। অধিকন্তু তিনি প্রচার করেন যে, সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য কোন পীর-দরবেশের প্রয়োজন নেই। এজন্য তিনি পীর-মুরিদ (পীরের শিষ্য) সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করেন। তিনি পীর-মুরিদ শব্দের পরিবর্তে উস্তাদ (শিক্ষক) এবং শাগরেদ (ছাত্র) শব্দ দুটিকে স্থলাভিষিক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন, "...he ordered that

the titles of Ustad and Shagrid, terms which did not suggest complete submission, should in future be used in the place of Pir and Murid, which had for ages been the respective designations of the master and his pupil." (Wise, 1883, p.22)

এছাড়া হাজী শরীয়তুল্লাহ পীরদের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রচলিত 'উরস' অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করেন এবং পীরের হাতে মুরিদ হিসেবে বাইয়াত নেয়ার সময় হাতে হাত রাখার বিরোধিতা করেন।

৫.২ বর্ণপ্রথা

হিন্দুদের বর্ণপ্রথাকে অনুসরণ করে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। আভিজাত্যের মানদণ্ডে আশরাফ-আতরাফ শ্রেণিতে মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। এমনকি পেশা ও জীবিকা অনুযায়ীও নিম্নশ্রেণি বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং বৈষম্য করা হত। তেলি বা কলু, পাল্কিবাহক বা কাহার, জোলা বা তাঁতি, কসাই, জেলেদের নীচু জাত মনে করে ঘৃণার চোখে দেখা হত। জেমস টেইলর তাঁর গ্রন্থে ঢাকা শহরের আতরাফ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের ১৪টি ভাগে ভাগ করে দেখান যারা হিন্দু সমাজের মতই সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার হত। তিনি বলেন,

> Several of the communities into which the lower classes of Mohammedans are divided, according to their occupations and employments, have assumed the character of castes and in regard to marrying and eating with each other, they are quite as exclusive as the Hindoos. (Taylor,1840, p.244-245)

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহ সমাজের এহেন অবস্থায় চিন্তিত হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সামাজিক ক্ষেত্রে আশরাফ-আতরাফ শ্রেণিভেদের সমালোচনা করেন। ইসলামে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনকারীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়েছে। তাই তিনি চাষা, কুলু, জোলাহ ইত্যাদি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দেন এবং সকল স্তরের মানুষের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রমের মর্যাদা বিষয়ক ইসলামী মূল্যবোধ প্রবর্তন করেন। তাঁর অনুসারীগণ নিজেদের মধ্যে বা বাইরে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেনা এ মর্মে তিনি তাদের নিকট থেকে শপথ নিতেন। তাঁর এ নীতিতে অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণি, তাঁতি, কুলু মুসলমানগণ আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যায়। (খান,২০০৭)

৫.৩ মহররম

হাজী শরীয়তুল্লাহ মহররমকে পবিত্র বলে আখ্যা দেন। তাঁর মতে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পূর্ববতী নবীগণ এই মাসকে বিশেষ করে এর দশম দিনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দিনে মহান আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, আরশ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর কুরসী তৈরি করেন। এ কারণে ফরায়েজীগণ আশুরা ও তার পরদিন রোযা রাখতেন, ইবাদতে রাত কাটাতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং এর

মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠত। কিন্তু ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের স্মৃতি রক্ষার্থে তাজিয়া মিছিলসহ যেসব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এসব অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিল নিষিদ্ধ। (Taylor,1840)

৫.৪ জন্ম সংক্রান্ত উৎসবাদি

তৎকালে একজন শিশু জন্ম নেয়ার পর অনেকগুলো অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। এতে গরমের দিনে ছয় দিন এবং শীতের সময় একুশ দিন 'অশুচিঘর' বা 'চাটি ঘর' এর দরজায় শিশুর জন্ম উপলক্ষে আগুন জ্বালানো হত। ঘরের কোনায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা হত। ঘর অন্ধকার হলেই অশুভ কিছু হতে পারে এই ধারণা থেকে বিরতিহীন ভাবে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হত। (Wise,1883, p.50)

হাজী শরীয়তুল্লাহ এই প্রথাগুলোকে ত্যাগ করে আকীকা অনুষ্ঠান পালন করতেন শিশুর জন্মের প্রথম এবং চল্লিশতম দিনে। এতে পুরুষ সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করা হত। এছাড়া শিশুর মাথা ন্যাড়া করে পিতা-মাতার সামর্থ অনুযায়ী চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা অথবা এর মূল্য গরিবের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। (Taylor,1840)

৫.৬ দাই প্রথার সংস্কার

নবজাতক সন্তানের নাড়ি কর্তনকারী মহিলাদের দাই বলা হত। দাইদের কাজকে সমাজে নিম্নমানের কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হত। অভিজাত হিন্দু এবং মুসলিমগণ প্রয়োজনের সময়েও নাড়ি কর্তনের কাজটি দাইদের জন্য রেখে দিত। এতে প্রসূতি মায়ের দূর্দশার সীমা থাকতো না। কারণ 'দাই' এর সংখ্যার স্বল্পতার জন্য তাদেরকে সবসময় পাওয়া যেত না। হাজী শরীয়তুল্লাহ এ কঠিন সময়ে এগিয়ে আসেন। তিনি নবজাতকের নাড়ি কাটার জন্য এককভাবে দাইকে ব্যবহার করার নিন্দা করে এই কুসংস্কারপূর্ণ প্রথাটি প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি পরিবার বা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা কিংবা প্রয়োজন হলে নবজাতকের পিতাকেও নাড়ি কাটার অনুমতি দেন। (খান,২০০৭) হাজী শরীয়তুল্লাহর এসব সংস্কার কাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে চরমভাবে আন্দোলিত করেছিল। ফলে তারা ফরায়েজীদের 'নাড়ি-কাটা বলে বিদ্রুপ করত। সকল কুসংস্কার দূরীভূত করণের মাধ্যমে তিনি মূলত মুসলিম জাতিসত্তার চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন অনাচার থেকে সমাজকে পরিশুদ্ধ করেছিল। জেমস ওয়াইজ বলেন,

> It is a curious fact that none of these new ideas exited much opposition, but on his promulgating the dogma that it was a deadly sin, and one derived from the Hindus, to allow a midwife to cut the navel cord when it was the obvious duty of the father to do so, he roused a spirit of revolt which caused many to fall away. (Wise, 1883, p.22)

৫.৭ মৃত ব্যক্তির দাফন পদ্ধতি

হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী মতার্দশে কবরে ফুল-ফল দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্নের সাথে সংশ্লিষ্ট ফাতিহা অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়। তাঁরা অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে দাফন কাজ সম্পন্ন করতেন এবং কবরকে মাটিতে সমতল করতেন এবং এতে ইট বা পাথর দিয়ে কোন সমাধি তৈরি করা হত না। (Taylor, 1840)

৫.৮ পোষাকের স্বাতন্ত্রতা

হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে ধুতির পরিবর্তে লুঙ্গী বা পায়জামা পরতে বলেন। কেননা, ধুতি হিন্দুদের জাতীয় পোষাক। তাই মুসলমানদের একে বর্জন করা উচিত। তাঁর মতে, পাজামা বা লুঙ্গী নামাজের সতর ঢাকার জন্য বেশী উপযুক্ত। কারণ এতে উরু উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু যদি কাউকে প্রয়োজনে ধুতি পরিধান করতেই হয় তবে সে যেন তা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে না টেনে সাধারণ ভাবে পরিধান করে। (খান,২০০৭)

৪.৯ বিয়ে সংক্রান্ত

হাজী শরীয়তুল্লাহ বিয়ে উপলক্ষে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন, হলুদ দেয়া, রব-কনের পোষাক সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি, আনন্দ মিছিল ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করলেন। এর বিপরীতে বিয়ের সময় সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সুন্দর পোষাকে বর-কনেকে উপস্থিত করে বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং বিবাহোত্তর ওয়ালিমার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনকে আনন্দঘন পরিবেশে আপ্যায়নের সু-ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। (Taylor,1840)

জমিদারদের বিরোধিতা

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের কারণে পূর্ব বাংলার বড় বড় জমিদারী হিন্দু বিত্তশালীদের হস্তগত হয়। তারা কৃষক প্রজাদের উপর অনেক অবৈধ কর আরোপ করে তাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তোলে। এ সকল করের মধ্যে শ্রাদ্ধ খরচা, পৈতা খরচা, রথ খরচা এবং দূর্গাবৃত্তি ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাওহীদ বিরোধী এ করসমূহ পরিশোধের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, এসব কর পরিশোধ করা পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দেয়ার নামান্তর। তাই তিনি ফরায়েজী কৃষকদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী এসব কর প্রদান করতে নিষেধ করেন। তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত হানে। তাই এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তারা ফরায়েজীদের উপর 'দাড়ি কর' আরোপ করে। এর ফলে হিন্দু জমিদার ও ফরায়েজী কৃষক সমাজের বৈরী সম্পর্ক আরো তীব্র হয় এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে যায়। এছাড়া সাধারণ মুসলমানদের দূর্বলতা ও মুসলিম কর্মকর্তাদের সরকারী চাকরি থেকে ছাটাইয়ের ফলে গ্রামীণ মুসলিমদের মধ্যে যে দূর্বলতা সৃষ্টি হয় তার সুযোগে হিন্দু জমিদারগণ তাদের এলাকায় গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ এ বিষয়টি পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করা মনে করে এর প্রতিবাদ করেন। কারণ হিন্দুরা গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। জমিদারদের এসব কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে তিনি

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালের শুরুতে তিনি ফরায়েজী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তাঁর এই কর্মসূচীতে জমিদারগণ আতংকগ্রস্ত হয়ে তা প্রতিহত করতে বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান 'Social History of the Mushims Bangladesh Under the British Rule' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

> He was accused by the Hindu zamindars of attacking a Hindu temple, breaking idols, terrorizing the Hindu population by the aggressiveness of himself and his followers as well as disrupting the Muslim society by preaching *Wahhabi* doctrines, declearing British India as an abode of war (*Darul Harb*) and entertaining the fanatic ambition of re-estalishing the *Badshahi* of the Muslims. (Khan, 1992, p 88)

সংস্কার আন্দোলনের বিরোধীতা

সময়ের পরিক্রমার সাথে সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহ সংস্কার কার্যক্রমের বিরোধীতা ক্রমবর্ধমান রূপ নেয়। একদিকে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ অন্যদিকে স্বার্থবাদী, শোষক জমিদার শ্রেণি নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় তাঁর বিরুদ্ধে সংঘাত ও সহিংসতার পথে অগ্রসর হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংঘাতের পথ পরিহার করে তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তথাপি ১৮৩১ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকা-জালালপুরের ফৌজদারী আইন সম্পর্কিত রিপোর্টে জানা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে শরীয়তুল্লাহর অনুসারী ও রামনগর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মতান্তর বিষয়ে সহিংসতা সংঘঠিত হয়েছে। এ রিপোর্টে আরো জানা যায়, এ ঘটনায় আদালত ফরায়েজীদের অভিযুক্ত করে তাদের নেতাদের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে দুইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর জেল প্রদান করা হয়। তাদের অনুসারীদেরকে একই দণ্ড দিয়ে প্রত্যেককে একশত টাকা জরিমানা করা হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এবং শান্তি রক্ষার কবজ হিসেবে এক বছরের জন্য ২০০ টাকা আমানত স্বরূপ রাখা হয়। (খান,২০০৭)

জেমস টেইলরের মতে, ফরায়েজীগণ অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে ইসলামী অনুসাশনের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ইসলামী ম ূল্যবোধের বিপরীত কোন বিষয়কে বিন্দুমাত্র ছাড় না দেয়ার প্রবণতা শহরে সহিংসতা ও হাঙ্গামার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া তাঁর অনুসারীগণের কিছু কর [যেগুলো ইসলামী মূল্যেবোধের সাথে সাংঘর্ষিক] আনাদায়ে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। এসব কারণে তাদের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহকে একাধিক বার পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়। (Taylor,1840)

হাজী শরীয়তুল্লাহর শেষ জীবন ও মৃত্যু

১৮৩৭ সালে তাঁর ছেলে মহসীন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া মক্কায় শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসলে তাঁর হাতে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব তুলে দেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন

সফলতার সাথে এগিয়ে চলে যা পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনের ভীতকে কাঁপিয়ে তোলে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে স্বাধীণতা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীগণ সফল ভূমিকা পালন করেন। ইংরেজদের বিতারিত করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন দেশ গঠনেও তাঁরা ফলপ্রসু অবদান রাখেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ সালে ৫৯ বছর বয়সে তাঁর নিজ গ্রাম শামাইলে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। এভাবেই একটি ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

মূল্যায়ন

পূর্ব বাংলার ইতিহাসের আকাশে উজ্বল এক নক্ষত্র হাজী শরীয়তুল্লাহ। এদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি বটবৃক্ষের মত তাদের ছায়া দিয়েছেন। যোগ্য অভিভাবকের মতো তাদের কাছে টেনে তাদের সমস্যা দূরীভূত করেছেন। ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করে স্বাধীনতার নতুন ভোরের সন্ধান দিয়েছেন এবং হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও দূর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসেবে তাঁর [হাজী শরীয়তুল্লাহ] আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল। আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা শরীয়তুল্লাহর চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। তাঁর নির্দেশ ও আদর্শ চরিত্র দেশবাসীদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দূর্যোগের দিনে সৎ পরামর্শ ও ব্যথা-বেদনায় সান্ত্বনা প্রদানকারী পিতার মতোই দেশের জনগন তাঁকে ভালোবাসতো।
অনেক কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ সফলতা পেয়েছিলেন। অনেক বাধা-বিপিত্তি, নিন্দা-সমালোচনাকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। একদিকে ব্রিটিশ শাসক ও জমিদার শ্রেণি, অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে নানা বিভাজন কেন্দ্রিক বিরোধিতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। সে সময় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যেই সাবেক, ফরায়েজী, তাইউনী এবং আহল-ই-হাদিস নামে চারটি মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ সাবেক শ্রেণীর নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এই মতাদর্শের লোকেরা হিন্দুধর্ম থেকে আগত ছিল। সমস্ত প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে। তৎকালীন ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের মুসলমানদের অধিকাংশ ফরায়েজী মতবাদকে গ্রহণ করে। গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি লাভের স্বপ্ন এ আন্দোলনের জনপ্রিয়তাকে তরান্বিত করেছিল। (মুরশিদ,২০১৪)

এছাড়া তাঁর জীবদ্দশাতেই তৎকালীন ত্রিপুরা জেলা অর্থাৎ কুমিল্লাতেও ফরায়েজী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে যোগ্য অনুসারীদের নেতৃত্বে তাঁর পুনরুজ্জীবনবাদী ফরায়েজী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের মসনদকে প্রকম্পিত করে তোলে।

উপসংহার

স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার কিন্তু পরাধীন দেশে বসবাস করে স্বাধীনতার সেই সুফল পাওয়া অসম্ভব। এর সাথে সাথে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকারটাও দুস্কর হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম। অত্যাচারী জমিদার, ব্রিটিশ শাসক ও ধর্মের নামে কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে স্বাধীন ভূখণ্ডে পবিত্র কুরআন হাদিসের প্রকৃত শিক্ষাকে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন উনিশ শতকের একজন মুজাদ্দিদ, বিজ্ঞ আলেম হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই যে সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর ছেলেসহ অনুসারীরা এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামী আদর্শের চেতনা ও স্বাদ মানুষের মাঝে এনে দিতে সক্ষম হন। হাজী শরীয়তুল্লাহর এ অবদান এ বঙ্গের মানুষ আজীবন মনে রাখবেন, কারণ তিনি একটি নাম, তিনি একটি ইতিহাস।

গ্রন্থপঞ্জি

করিম, ড. আবদুল। (২০০৬)। *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*। ঢাকা, বাংলাদেশ: কাকলী প্রকাশনী।

খান, ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ। (২০০৭)। *বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস* (ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া কর্তৃক অনূদিত)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী।

খান, মোশাররফ হোসেন।(২০১০)। *হাজী শরীয়তুল্লাহ* । ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

মোহাম্মদ, নূর। (২০১৫)। *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*। ঢাকা, বাংলাদেশ: জাতীয় সহিত্য প্রকাশ।

মুরশিদ, গোলাম।(২০১৪)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা, বাংলাদেশ: অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

লেনিন, ড. নূহ- উল-আলম। (২০১৫)। *বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ।* ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমী।

হান্টার, উইলিয়াম।(২০১৬)। *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (আবদুল মওদুদ কর্তৃক অনূদিত)। ঢাকা , বাংলাদেশ: আহমদ পাবলিশিং হাউস।

Choudhury, Nurul Hossein.(2020). Journal of International Studies, *Faraise Movement and Zamindars of Nineteenth Century Bengal: The story of a Peasant Movement*.

Faisal, Dr. Muhammad Ahsanullah ((2010). *Hazi Shariatullah's Faraize Movement History-Da'wah and Political Ideogy*, Dhaka, Bangladesh: Shariatia Library.

Hunter, William Wilson. (1888). *England's Work in India*. Madras, India: The Christian Vernacular Education Society.

Khan, Dr. Muin Ud Din Ahmad. (1992). *Social History of the Mushims Bangladesh Under the British Rule*. Dhaka, Bangladesh: Islamic Foundation.

Taylor, James. (1840). A *Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*. Calcutta, India: Military Orphan Press.

Wise, James. (1883). *Notes and the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*. London, England: Harrisan and Sons.